OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 291
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 281 - 291
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

# কিশোর সাহিত্যের মাত্রাভেদ ও লীলা মজুমদারের ভূতুড়ে গল্পের কথা : ‘সব ভুতুড়ে’ ও অন্যান্য

শ্রেয়সী রায়
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: royshreyasi6@gmail.com
iD 0009-0009-4240-7072

**Received Date** 20. 01. 2026
**Selection Date** 10. 02. 2026

***Keyword***
*Leela Majumdar, Adolescent Literature, Adventure, Friendship, Maternity, Women's Studies, Ghost Stories, Supernatural Stories, Humourist and Bizarre Stories.*

***Abstract***
*While we analyse Bengali juvenile literature (& also explore the global trends), we notice a recurring theme: the discourse of motion or journey. Adventure permeates various genres— detective, sci-fi, comedy, supernatural, and horror—emerging as a core element in young adult stories. In this context, we focus on the ghost stories by Leela Majumdar. First, we see how adventure and travel reappear in these tales, usually triggered by the protagonist visiting to an old house or ancestral home, or unfamiliar place. Most of the stories feature fearless, spirited, obstreperous boys and girls.*

*To capture the underlying patterns, we propose a tabular classification of Majumdar's ghost stories, which should reveal their fundamental motives. we then elaborate on several of those motives using representative stories. Our primary source is Majumdar's collection Sob Bhuture, supplemented by other anthologies that include tales like 'Bhuter Chele', 'Uluberiyar Bhuter Bari', 'Bakir Karbar' and 'Nepur Nobikaran'.*

*It's often seen that mothers were traditionally neglected or get a very shallow space in adolescent literature, yet Majumdar's writing gives generous space to maternal affection and motherhood within the juvenile narrative. Ultimately, beneath the ghostly surface, Majumdar's true aim is to convey humanity and warmth— friendship, compassion, and a journey from fear to fearlessness.*

## Discussion

।। ১।।

শিশু, অর্থাৎ কিনা শৈশব, একটি স্থান-নিরপেক্ষ, সময়ের অতীত, প্রাক-সামাজিক মাত্রা। কখনো ছেলেভুলোনো ছড়ার, কখনো বা রূপকথার দেশকালাতীত আবেদনের নিরিখে এমন কথা বারবার বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[১] লোকসাহিত্যের চিরন্তন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 291
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শিশুতোষ চরিত্রটিকে চেনার জন্য এই বক্তব্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু সুসাহিত্যের সর্বজনীনতার কথা মাথায় রেখেও এ-কথা মানতেই হয় যে ছোটোদের জন্য উদ্দিষ্ট পরবর্তী লেখালেখিতে, বিশেষত ব্যক্তিক সাহিত্য-রচনাসমূহে উদ্ধৃত শৈশব আর ততটা 'নিত্যকালের সেই পুরাতন'-টি হয়ে থাকতে পারেনি। শ্রুতি-সাহিত্যের এলাকা পেরিয়ে যেদিন শিশুকে প্রবেশ করতে হল প্রথমপাঠে অর্থাৎ প্রাইমারের দুনিয়ায়, সেদিন থেকেই তার প্রতিবেশকে কখনো প্রত্যক্ষত, কখনো বা পরোক্ষভাবে মুড়ে দেওয়া হতে থাকল বড়োদের নির্ধারিত ও নির্বাচিত, নির্দিষ্ট ও নির্মিত 'শৈশব'-এর সংজ্ঞায়। সেই শৈশব গভীর ও গূঢ় ভাবে কখনো নারী-উচিত, কখনো পুরুষ-উচিত, কখনো (যেমন প্রথম দিককার বাংলা প্রাইমারে, কিংবা শিশুসাহিত্যের বন্ধনীভুক্ত না হয়েও *গল্পগুচ্ছ*-এর 'অতিথি', 'আপদ'-এর মতো গল্পে) জাত্যাভিমানী, আর প্রায়শই নীতিবাগীশ। এর পরবর্তী স্তরে আছে কিশোরসেব্য রচনাবলি। তারা সাহিত্যের ইতিহাসের আরও নবীন জাতক। প্রসঙ্গত আরও একবার ফিরে যাই রবীন্দ্রনাথের কাছে। *জীবনস্মৃতি*-কার জানিয়েছিলেন তাঁদের শৈশবে বাংলা সাহিত্যের কলেবর ছিল কৃশ। সেইসঙ্গে ছিল না শিশুপাঠ্য ও বয়স্ক পাঠ্যের কোনো সুচিন্তিত ভেদরেখা। যদিও চিরকালের মতোই বড়োদের কিছু বৃথা চেষ্টা থাকত 'বড়োদের বই' পড়া থেকে ছোটোদের আটকানোর।[২] তবে ছোটোদের নিজস্ব সাহিত্য-সামগ্রী না থাকার এমন দুঃখকে ঘুচিয়ে দিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই শিশু-কিশোর পত্রিকা আর শিশু-কিশোর সাহিত্যের ঢল নেমেছিল বাংলা সাহিত্যে। ১৮৩৩-এর *পশ্বাবলী* থেকে *বালকবন্ধু* (১৮৭৮), *সখা* (১৮৮৩), *বালক* (১৮৮৫), *সাথী* (১৮৯৩), *মুকুল* (১৮৯৫)-এর মতো পত্রিকাগুলোর উত্তরাধিকার বহন করে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে (১লা বৈশাখ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ) *সন্দেশ*-এর যাত্রা শুরু। এই সন্দেশেই ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে (ভাদ্র ১৩৩০ বঙ্গাব্দ) সুকুমার রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় লীলা মজুমদারের প্রথম ছোটোদের গল্প : 'লক্ষ্মী ছেলে'। বাংলা সাহিত্যে ততদিনে তৈরি হয়ে গেছে কিশোর পাঠ্য সাহিত্যের একটি সুস্পষ্ট ধারা।

ছড়ায়-ছন্দে, রূপকথায়-উপকথায় লোকসাহিত্যের নতুন নির্মাণের[৩] পাশাপাশি কিশোরসাহিত্যে পাওয়া গেল একটি বিশিষ্ট সংরূপের অনুবর্তন— অ্যাডভেঞ্চারধর্মী বা অভিযানধর্মী সাহিত্য। এই সংরূপের আবার আছে একাধিক উপ-সংরূপ (sub-genres); আপাত মিলহীনতা সত্ত্বেও যাদের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে একটি অন্তর্গূঢ় সাদৃশ্যরেখা। সে-কথায় যাওয়ার আগে অবশ্য এ-ও উল্লেখ করা জরুরি যে যাত্রা (journey) বা গতিময়তা যাবতীয় শিশু-কিশোর সাহিত্যেরই একটি প্রাথমিক লক্ষণ। রূপকথার রাক্ষসহন্তা রাজপুত্র, রাজকন্যা-বিজেতা রাজপুত্র, কিংবা মৃগয়াবিলাসী রাজা— সকলেই আদতে এই অভিযান সাহিত্যেরই পূর্ব-শরিক। যাইহোক, আমরা ফিরে আসছি অভিযানধর্মী সাহিত্য-সংরূপদের অন্তঃশীল সাদৃশ্যসূত্রটির কথায়। অভিযান সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে প্রোটাগনিস্ট নায়ক যাত্রা করেছে নিরাপদ গার্হস্থ্যের গণ্ডি ভেঙে।

**(১) গোয়েন্দা-কাহিনি :** রূপকথার প্রথমোক্ত কাঠামোটির প্রভাব এতে প্রবল। প্রোটাগনিস্ট এখানেও গৃহস্থের স্বভাবজ নিশ্চলতার ডোর ছিঁড়ে যাত্রা করে জীবনের আপাত-সংশয়াকুল শঙ্কাময় পথগুলিতে, যেখানে আছে রহস্য, আছে নতুন দেশ; নতুন মানুষ, কিংবা অপরাধ ও অপরাধী-মনস্তত্ত্ব। লক্ষণীয় যে কিশোর-পাঠ্য গোয়েন্দা গল্পগুলো (ফেলুদা, কাকাবাবু, অর্জুন, মিতিন-সিরিজ সহ অজস্র উদাহরণ মিলবে) প্রায় অনিবার্যভাবেই কোনো একটি ভ্রমণকাহিনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে।

**(২) কল্পবিজ্ঞান :** এই অভিযানের সঙ্গেই একসময়ে যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞান; বলা ভালো সম্ভব-অসম্ভব সব বৈজ্ঞানিক প্রকল্পনা। বিজ্ঞানের অসাধ্যসাধনের সঙ্গে কল্পনার জোট বাঁধা এইসব গল্পের জন্মভূমি স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিম-ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এসব গল্পের অভিযাত্রীরা বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে পাড়ি জমাচ্ছিল অসম্ভবের রাজ্যে, ভিনগ্রহ থেকে পাতাললোকে।

কিন্তু বিজ্ঞানের বহুল জয়ধ্বনির মাঝেই অপ্রতিরোধ্য বিজ্ঞানশক্তির বিভিন্ন অভিশাপের গল্পও তৈরি হচ্ছিল বিদেশে; এবং ক্রমানুসারে স্বদেশে। মেরি শেলির 'Frankenstein' (প্রকাশ : ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ) থেকে শুরু করে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা কিংবা সত্যজিতের শঙ্কু-সিরিজের বেশ কিছু গল্পে গর্বান্ধ বিজ্ঞান ও অবিবেকী বিজ্ঞানীর এমন কিছু প্রকৃতি ও মানবসভ্যতা-বিরোধিতার ছবি পাওয়া যাবে। আধুনিক পৃথিবীর যুদ্ধ, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ইত্যাদি বিবিধ সমস্যার সূচক কিংবা

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 31*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 291*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

সহায়ক হিসেবে বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ এরপর যেসব গল্পের আড়ালে আশ্রয় খুঁজে পায় তার অন্যতম হল অলৌকিক গল্পকাহিনি; যেখানে আছে যুক্তির প্রতিস্পর্ধী একটি অন্য বিশ্ব।

**(৩) কৌতুক-কাহিনি :** এই ধরনের কৌতুক গল্পগুলোর মূল অদ্ভুত রসে। সেই সঙ্গে এখানে থাকে হিউমার অথবা স্যাটায়ার। কৌতুক-গল্পের প্রত্নরূপ ছিল একটি বিশেষ ধরনের রচনায়— মজলিশি বা বৈঠকী গল্পকাহিনি। অভিযান, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান সমস্ত শাখাতেই তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশ এবং দেশবাসীর অংশগ্রহণ নগণ্য। দৈনন্দিনের যাপনের শ্রম ও ক্লান্তি পেরিয়ে দূরের হাতছানি শোনার কিংবা পাড়ি দেবার মতো উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তি তাদের দেহ-মনের পক্ষে এমনই বাতুলতা যে তার বলা অ্যাডভেঞ্চার কিংবা কল্পবিজ্ঞানের গল্প হয়ে দাঁড়ায় মিথ্যে বড়াই, নিজেকে কিংবা নিজেরই চারিপাশকে করা বিদ্রূপ, অতএব— গুল।[৪] এই ধরনের মজলিশি গল্পের একটি যথেষ্ট পুষ্ট ধারা আমরা পাই কিশোর-সাহিত্যে। এর মধ্যে রয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিনডিদা, গৌরকিশোর ঘোষের ব্রজদা প্রমুখ (উল্লেখ করা চলে সুকুমার রায়ের হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের কথাও)। এরা সকলেই বড়ো বড়ো কথা বলে, বিশ্বজনীন ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের বৃহৎ ও তাৎপর্যপূর্ণ সব ক্রিয়াকর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সত্যিকারের যাত্রী না হলেও এদের আমরা বলতে পারি কল্প-পথিক, কিংবা কল্প-অভিযাত্রী।

**(৪) অলৌকিক ও ভয়ের গল্প :** বিজ্ঞানপর্বের প্রবল যুক্তি-পরমতায় জীবন যখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, যখন বিজ্ঞানের অভিশাপ আধুনিক মানুষের নিরাপত্তাকে বাতিল করেছে অলীক বলে, তখন নতুন করে কল্পনার ভিতর দিয়ে অসম্ভবের কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা শুরু হল। বিশ্বাস যেমন সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, তেমনই দেখা গেল যুক্তিরও সীমা আছে। ফলে যুক্তিকে ডিঙিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা লালিত হল মনের গভীরে। আকর্ষণীয় হল বিজ্ঞানের প্রতি অবিশ্বাস জ্ঞাপনের মুক্তি। নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ যাপনের গণ্ডির বাইরে এসে এখানে প্রেয় হল অলৌকিকের আততি এবং ভয়।[৫]

গোয়েন্দা-কাহিনি, কল্পবিজ্ঞান, কৌতুক গল্প কিংবা অলৌকিকের মধ্যেকার এই সমস্ত সমাপতন আরও স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়, যখন আমরা লক্ষ্য করি প্রায় সমস্ত কিশোর-সাহিত্য প্রণেতারা একই সঙ্গে লিখেছেন গোয়েন্দা, অলৌকিক, ভয়, কল্পবিজ্ঞান— সমস্তই। এক্ষেত্রে জনপ্রিয় বিদেশি লেখকেদের মধ্যে যেমন রয়েছেন এডগার এলান পো, এইচ জি ওয়েলস, জুল ভার্ন, কোনান ডয়েলরা; বাংলায় তেমন আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায়, লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায় থেকে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়রা।

।। ২।।

আমাদের পূর্বে আলোচিত কিশোর-সাহিত্যের মতোই লীলা মজুমদারের সিংহভাগ ভূতুড়ে গল্পেরও চরিত্রমূলে রয়েছে অ্যাডভেঞ্চার। পুরোনো বাড়ি থেকে পুরোনো ভিটে — আছে রহস্যের খাসমহলে যাত্রার গল্প। আছে নিয়ম-ছুট দস্যি ছেলেদের (এমনকি মেয়েদেরও) দল। আছে কৌতুকের মিশেল দেওয়া অলৌকিক গল্প। প্রথানুগভাবেই সে-ধরনের গল্পের মজলিশি টান প্রবল; অর্থাৎ তারা লেখার ও পড়ার গল্প কম; বলার আর শোনার গল্প বেশি। তাছাড়াও আছে জীবনের পরপারেও কৃতজ্ঞতাসূত্রে ও কর্তব্যপাশে আবদ্ধ নারী-পুরুষেরা। শিলংয়ের পার্বত্য ও আরণ্যক ছেলেবেলার সাক্ষ্য বহন করে লেখিকার কিছু ভূতুড়ে গল্পে এসেছে পশুপাখির সঙ্গে সখ্যতার প্রসঙ্গ। লীলার গল্পের রচনাকাল মোটামুটি বিধৃত হয়ে আছে বাঙালির একান্নবর্তী পরিবারগুলোর ভাঙনের কালে, ভিটে-মাটি হারানোর কালে, ছিন্নমূল মানবতার কালে। তাঁর ভূতের গল্পে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে বহুবার এসেছে যুদ্ধ আর আকালের প্রসঙ্গ। এসেছে পুরোনো জমিদার বাড়িগুলোর শরিকি বিবাদের কথা; ঈর্ষা, লালসা, স্বার্থপরতার কথা।

এইসব প্রবণতার সূত্র ধরে প্রথমেই লীলা মজুমদারের ভূতুড়ে-অদ্ভুতুড়ে গল্পগুলোকে যথাসম্ভব ছকে ফেলার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। অবশ্য বলাবাহুল্য, এ কোনো জল-অচল শ্রেণি বিভাজন নয়। অর্থাৎ একাধিক প্রবণতার আওতাও যেমন পড়তে পারে একই গল্প, তেমনই এই বিন্যাসের বাইরেও অবশ্যই থেকে যাবে লীলার অনেক ভূতুড়ে আখ্যায়িকা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 31*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 291*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

তবু নিম্নোদ্ধৃত শ্রেণিকরণ হয়তো আমাদের সাহায্য করবে পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে লেখিকার গল্পসমূহের কয়েকটি মৌল লক্ষণকে চিনে নিতে।

| **মৈত্রীর গল্প** | **পুরোনো ভিটের গল্প** | **মাতৃত্বের গল্প, বৎসলতার গল্প** | **কৃতজ্ঞতার গল্প, দায়িত্ববোধের গল্প** | **কৌতুক গল্প** | **পশুপ্রীতির গল্প** | **যুদ্ধ ও আকালের প্রসঙ্গ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অহিদিদির বন্ধুরা | আহিরীটোলার বাড়ি | অহিদিদির বন্ধুরা | উলুবেড়িয়ার ভূতের বাড়ি | আকাশ পিদ্দিম | তোজো | অশরীরী |
| তেপান্তরের পারের বাড়ি | ইংরিজি স্যার | আহিরিটোলার বাড়ি | ছায়া | খাগায় নমঃ | ফ্যান্টাস্টিক | কলম সরদার |
| তোজো | উলুবেড়িয়ার ভূতের বাড়ি | নেপুর নবীকরণ | নাথু | দজ্জাল বউ | | ট্যাঁপার অভিজ্ঞতা |
| পাশের বাড়ি | কর্তাদাদার কেরদানি | ভ্-ভূত | পাঠশালা | দামুকাকার বিপত্তি | | তেপান্তরের পারের বাড়ি |
| পিলখানা | চেতলায় | | বাকির কারবার | | | নাথু |
| পেনেটিতে | নাথু | | বাপের ভিটে | | | লাল টিনের ছাদের বাড়ি |
| ফ্যান্টাস্টিক | নেপুর নবীকরণ | | লাল টিনের ছাদের বাড়ি | | | শেল্টার |
| ভ্-ভূত | পাঠশালা | | শেল্টার | | | স্পাই |
| লক্ষ্মী | পিলখানা | | হরু হরকরার একগুঁয়েমি | | | |
| | বাকির কারবার | | | | | |
| | বাপের ভিটে | | | | | |

।।৩।।

আমরা উল্লেখ করেছি লীলা মজুমদারের ভূতুড়ে গল্পের অ্যাডভেঞ্চারধর্মিতার কথা। তবে অ্যাডভেঞ্চার গল্পের চিরাচরিত নিয়ম যেখানে উত্তেজনা, ভয়-বিস্ময় আর সাহসের বয়ান, লীলা সেখানে বেছে নিয়েছিলেন মন-কেমনিয়া নস্টালজিয়া, আর সহজ (নাকি অ-সহজ!) মানবিক হৃদ্যতার বয়ানকে। তাঁর গল্পে প্রায়ই দেখব ভূতুড়ে বাড়িতে কি পূর্বপুরুষের ভিটেয় গিয়ে প্রোটাগনিস্ট কিশোর অথবা নারীটি বন্ধুতা এবং মমতায় জড়িয়ে পড়েছে এমন সব ‘লোক’জনের সঙ্গে, যাদের উপস্থিতি আসলে অ-লৌকিক। ‘উলুবেড়িয়ার ভূতের বাড়ি’, ‘বাকির কারবার’ কিংবা ‘পাঠশালা’-র মতো ভূতের গল্পগুলোয় ‘ভূতেরা’ই বরং মানুষকে শিখিয়ে দিয়ে গেছে মানুষী হৃদ্-বৃত্তির পাঠ।

‘পেনেটিতে’ গল্পের কিশোরটি যেমন মামাবাড়িতে থাকতে এসে বন্ধু পাতিয়ে ফেলে ‘তিনজন মাঝি গোছের লোক’ শিবু, সুজি আর গুজির সঙ্গে। শিবু বুড়োমানুষ, তার ভাইপো সুজি-গুজি কথকের সমবয়সী। শিবুরা তাকে মাছ ধরা শেখায়, সাপে কামড়ানোর ওষুধ, বিছে লাগার ওষুধ শিখিয়ে দেয়। এমনকি ভূতের বদনাম-ওয়ালা মামাবাড়িতে মামার অনুপস্থিতির রাতগুলোতে তার বড়ো ভয় করে শুনে শিবুরা জলের পাইপ বেয়ে দোতলায় উঠে এসে ‘কত যে গল্প করত তার ঠিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 31*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 291*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

নেই’। অবশেষে ইস্কুলের দুষ্টু সহপাঠীদের শায়েস্তা করার জন্য ভূতের ভয় দেখাতে গিয়ে শিবুদের সত্যিকার ভৌতিক পরিচয়টা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ল বটে। কিন্তু তবু ভয় নয়, পাঠকের মনে বরং এইসব বন্ধুতাকাঙ্ক্ষী ভূত-ক’টির জন্য দিনান্তের কিছু রাঙা মায়া-ই রয়ে গেল।

‘আহিরিটোলার বাড়ি’-তে না-মানুষ প্র-প্র-পিতামহ ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা প্রোটাগনিস্ট কিশোরকে যত্নআত্তি করে রাখেন। কিছুতে না শিখতে পারা অঙ্কগুলো জলের মতো সহজ করে শিখিয়ে দেন, এমনকি শিখতে পারার পুরস্কার হিসেবে দেন একটি সেকেলে মোহর। আর আমরা বুঝি যে এই গল্পের আসল সোনার মোহর হল সেই চিরকালের পুরোনো যত্ন-স্নেহ-ভালোবাসার আখ্যানটি, যার পাঠ নিলে জীবনের সব কঠিন অঙ্কই ‘জলের মতো সোজা’ হয়ে যায়।

এমনই আরেকটি গল্প ‘পিলখানা’। পুজোর ছুটিতে দেশের বাড়ি এসে জলবসন্তে ঘরবন্দী হয়ে পড়েছিল বছর এগারোর কিশোরটি। অমলের মতো তারও নিরানন্দ রোগশয্যার একমাত্র মুক্তিপথ ছিল একখানি কেবল জানলা। সেই দোতলার জানলাটিতে একদিন হঠাৎ ছুটির ঘণ্টি বাজিয়ে এসে দাঁড়াল কুড়িটা হাতির দল-সহ মাহুত হাইদার। তারপর থেকে দুঃখ হলেই জানলায় এসে দেখা দেয় হাইদার। মোতি হাতি শুঁড়ে করে তাকে আতা দেয়, হাইদার গল্প শোনায়, বন্দী ঘরের তোরঙ্গে-সিন্দুকে জমানো গুপ্ত সব মজার অন্ধিসন্ধি বলে দেয়। কাছেই নাকি আছে হাতিদের পিলখানা। সেখানে থাকে তারা সব। বাড়ি ফিরলে পর বাবা অবশ্য তাকে জানান পিলখানা আসলে সে অঞ্চলের একশ’ বছরেরও আগের মুছে যাওয়া ইতিহাস। তবে ছেলেবেলার দুঃখদিনে তিনিও এই হাইদার মাহুত আর তার হাতিদের দেখা পেতেন।

> “...আর দেখোনি বাবা?
> বাবা বললেন, ‘না রে, শুধু দুঃখী লোকেরা ওদের দেখতে পায়।’”[৬]

অঙ্কে কম পেয়ে বাড়িতে বকুনি শুনে রেগেমেগে ঘর ছেড়েছিল ‘আহিরিটোলার বাড়ি’-র কিশোর কথক। আর ছেলে-বৌয়ের ওপর রেগেমেগে ঘর ছেড়ে অজ গাঁয়ে বাপ-পিতেমোর পরিত্যক্ত ভিটেয় এসে উঠেছিলেন ‘বাপের ভিটে’-র গয়নাদিদি। সেই নন্দীবাড়ির ভিটেটি অদ্ভুত। শোনা যায় নাকি পরিত্যক্ত ভিটে; অথচ ডাকলেই ঝটিৎ-পটিৎ কাজ সেরে রেখে দেয় যেন কারা। শেষে কাজের কর্তা এক কিশোর আর তার মায়ের দেখা মেলে। যদিও চাঁদের আলোয় তাদের ছায়া পড়ে না, তবু তাদের পেয়ে ভারি খুশি হন গয়নাদিদি। ভালোমন্দ রাঁধা হলে তাদের ঘরে পাঠিয়ে দেন। কালো, রোগা, উদোম কিশোরটিকে নিজের গায়ের চাদর খুলে ঢেকে দেন। কালো, কঠিন, উলঙ্গ হৃদয়বৃত্তিগুলোর ওপরও এসে পড়ে ভালোবাসার উষ্ণ নরম চাদর।

।। ৪।।

জনয়িত্রী পালয়িত্রীদের নারীদের সঙ্গে কৈশোরের বড়ো আড়াআড়ি। সন্তর্পণে আগলে রাখার, আঁচহীনতার আঁচলে মুড়ে রাখার মাতৃত্বকে সরিয়ে দিয়েই পাড়ি দেয় কিশোর গল্পের নায়কেরা। আমরা আগেই দেখেছি শিশু-কিশোর সাহিত্যের সামগ্রিক বয়ানের (discourse) অন্যতম হল তার গতি। শৈশবের পরবর্তী যে আশ্রম – গার্হস্থ্য, তার ঠিক বিপরীতে থাকে এই উপাদান। কিন্তু চিরাচরিত সমাজবিশ্বাসে মেয়েরা যে গৃহের প্রতীক। তাই পুরুষের আশ্রয় নির্মাণের জন্য তাদের প্রথমাবধি হতে হয় ধীর, স্থিত, শান্ত। সুতরাং তাদের অংশগ্রহণ, এমনকি উপস্থিতি-ও এই পর্যায়ের আখ্যানে থাকে অনাকাঙ্ক্ষিত। কিশোর সাহিত্যে কিশোরীদের অংশগ্রহণের ইতিহাস অন্য। আপাতত আসা যাক মায়েদের ইতিকথাটুকুতে। কিশোর সাহিত্যের আবহমানতায় মাতৃচরিত্রের উপস্থিতি অতি-নির্ধারিত (over-determined)। কারণ ‘মুগ্ধ জননী’র মাতৃত্ব যে স্নেহের পিছুটান তৈরি করে তা ‘গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া’দের অভিযাত্রার পক্ষে বিঘ্নের।

এ-পর্বের গল্পোগাথায় মায়েদের উপস্থিতি তাই বড়োজোর সীমায়িত থাকে প্রথম অধ্যায়ের স্বস্তিবাচনটুকুতে। নতুবা গল্পশেষে ঘরে-ফেরার টান হয়ে, মধুর-করুণ অপেক্ষার চিরন্তন নারীমূর্তিটি স্মরণ করাতে ফিরে আসেন তাঁরা। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘ভোম্বল সর্দার’, বিভূতিভূষণের ‘চাঁদের পাহাড়’, অবনীন্দ্রনাথের ‘নালক’, ‘বুড়ো আংলা’, শিবরাম চক্রবর্তীর ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’, লীলা মজুমদারের ‘হাওয়ার দাঁড়ি’— যাবতীয় উদাহরণে ঘর-ছুট কিশোর ও তরুণদের মনে গল্পশেষে ঘরের টান জাগিয়ে তোলেন স্নেহ সম্পর্কীয়ারা।

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 291
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কোথাও বা সমস্যার সমূল উৎপাটন করতে মুছে দেওয়া হয় পিছুটানের সম্ভাবনা। ফেলুদার গল্পে ফেলুদের পরিবার-পরিজনহীনতা বিষয়ে যে দুঃখ লীলা মজুমদার করেন[৭] তারও উৎস আছে এখানেই।

কিন্তু পরিজনহীনতার দোষে দুষ্ট নয় লীলার গল্প বা উপন্যাসগুলো। সেখানে প্রোটাগনিস্ট বালককে (অল্প-পক্ষে বালিকাদের) ঘিরে থাকেন জাঁদরেল, রাগী, মজারু, কুচুটে, কিংবা স্নেহময় অনেক মাসি, পিসি, মামা, কাকা, বড়দাদু কি বড়ঠামুরা। ব্যতিক্রম নয় তাঁর ভূতুড়ে ও অদ্ভুতুড়ে গল্পগুলোও। তাঁর গল্পের চোর, ডাকাত, ভূত কেউই ভয়াল ভয়ঙ্কর নয়।[৮] *সব ভুতুড়ে* বইটির মুখবন্ধে লীলা লিখেছিলেন—

> "শুনেছি মরে গেলে শরীরের এক কণাও নষ্ট হয় না। সবই, পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে চিরকাল রক্ষা পায়। তাহলে মানুষের সত্তার শ্রেষ্ঠাংশই বা বিনষ্ট হবে কেন? আরো বলি, মরে গেলে সেই শ্রেষ্ঠাংশের একটা অশুভ পরিণতিই বা হবে কেন? বিধাতার মঙ্গলবিধানে আমার আস্থা আছে, তাই আমার এই ভূতদের একটু সুনজরে দেখতে হবে।"[৯]

কিন্তু মানুষের কুৎসিততম স্বার্থ, দ্বেষ আর জিঘাংসার বলি হয়েছে যারা, এমনকি যে শিশু ও কিশোরেরা, তারাও কেউ অসুন্দর হয়নি তাঁর গল্পে। দুঃখী, দুর্ভাগা কৈশোর তাঁর ভূতের গল্পে ফিরে আসে প্রতিহিংসার মুখ নিয়ে নয়; বরং জীবদ্দশায় না পাওয়া স্নেহ-কোমল ভালোবাসার আঁচটুকুকে শরীরহীন সত্তায় মেখে নিতে। আর সেখানেই লীলা মজুমদারের নারীকলম জয়তিলক পরিয়ে দেয় কিশোর সাহিত্যের অন্যত্র ব্রাত্য মাতৃত্বের শিয়রে। তেমনই একটি গল্প 'অহিদিদির বন্ধুরা'।

অহিদিদির স্বামী সুরেনবাবু পেনশন নেবার পর কালীঘাটের পুরোনো বাসা ছেড়ে অজ পাড়াগাঁয়ে বসবাস শুরু করলেন। সেই প্রায় জনহীন শহরতলিতে অহিদিদির বাসার আনাচে কানাচে একদিন আরম্ভ হল ক'টা রোগা-রোগা কালো-কালো নোংরাপানা ছেলেপিলের উপদ্রব। তারা উঁকি-ঝুঁকি দেয়, খাবার চুরি করে। 'অহিদিদির বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল'। তবে না, ভূতের ভয়ে নয়; নিরালা বাড়িতে অচেনা ছেলেদের আনাগোনাতেও নয়; বরং তাঁর মনে হল—

> "আছে তাহলে ছেলেপুলে এই নির্বান্ধব পুরীতেও। কালীঘাটের বাড়িতে ছেলেপুলে ছিল না। বাড়িটা ছিল শ্মশান। অহিদিদির ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। শাশুড়ি কোনো ছোট ছেলের গলার আওয়াজ পেলে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে যেতেন। কেউ আসত না ওঁদের বাড়িতে, কেউ গল্প শুনতে চাইত না, খাবার চুরি করে খেত না। বাড়ি, না কি শ্মশান! অহিদিদি গলা তুলে ডাক দিলেন।
> 'কে রে আমার সর খায়, মাছ খায়?' অন্ধকারের মধ্যে ঠেলাঠেলি চুপ।
> অহিদিদি বললেন, "আয়! গোলাপী বাতাসা দেব, ভাজা মশলা দেব, পরীদের দ্বীপের গল্প বলব।""[১০]

লক্ষ্য করবার মতো বিষয়টি হল, চিরাচরিত নিয়ম ভেঙে এখানে শ্মশানের সঙ্গে দু-দু'বার তুলনীয় হয়ে উঠল যে বাড়িটি সেটি কিন্তু যথার্থ ভূতের বাড়ি নয়; বরং ভূতুড়ে উপদ্রবহীন শান্ত সম্ভ্রান্ত ভদ্রাসন। অথচ ছেলেপিলে না-আসা, খাবার চুরি না-যাওয়া, গল্প শোনানোর আবদার না-করা সেই বাড়িটিই অহিদিদির ভাবনায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সত্যিকার শ্মশান; জিজীবিষার পর-পিঠ। এরপর অহিদিদির কাছে আদরে, খাবারে, গল্পে ছেলেগুলোর পরের চারটি মাস কেটে গেল। অবশ্য এই ছোটো-ছোটো বন্ধুরাও অহিদিদিকে এ ক'দিন ঘিরে রাখল নিরালা দুপুর-সন্ধ্যের ভয় থেকে, একাকিত্ব থেকে; আর হয়তো উপোসী মাতৃত্ব থেকেও। সুরেনবাবুর আবার বাসা-বদলের সময় এলো। পৌষ-পার্বণে পেট ভরে পিঠে খেয়ে আর 'ফোঁচ-ফোঁচ' করে খানিক কেঁদে শেষবারের মতো বিদায় নিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল ছেলের দল। যাবার দিন গয়লা-বৌয়ের মুখে অহিদিদিরা শুনল, তাদের এ বাসাটি এককালে ছিল মস্ত এক সদাগরের। একবার ভোরবেলায় বাবু-বাড়ির বাসি পিঠে খেতে এসে হট্টগোল করায় সদাগর-কর্তা গয়লাপাড়ার ক'টি ছেলেপিলের জিভ কেটে দিয়েছিল। সেই থেকে এ পাড়ার আম-বাগানে আর বোল ধরে না। কিন্তু, -

> "আশ্চর্যের কথা কি জান মা এক্ষনি দেখে এলাম গাছে গাছে মকুল এসেছে। যাই, মা। এসব হলে আমরা দুঃখীরা দেবতাদের পূজো দিই।"[১১]

বীভৎস নির্মমতা দিয়ে চিরকালের দেবতার কাছে যে অতীত অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল অহিদিদি তাঁর ভালোবাসার নির্মঞ্ছনে আজ তাকে মুছিয়ে দিয়েছেন। তাই নিষ্ফলা গাছ আবার ফলবান হয়েছে। ভূতের গল্পের প্রথাসিদ্ধতার বাইরে গিয়ে 'অহিদিদির বন্ধুরা' তাই শেষপর্যন্ত একটি আশীর্বাদের গল্প; অভিশাপের গল্প নয়।

'ভ-ভূত!' গল্পটিতে আছে সাহেবপাড়া ভবানীপুরের এক পুরোনো বাড়িতে ভাড়া থাকা এক সন্তানহীনা গিন্নির গল্প। তাঁর স্বামী প্রায়ই ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেন, আর ভীরু গিন্নিটি রাতে রান্নাঘরের পাশের একফালি খোলা ছাদে গিয়ে কান্নাকাটি করতেন, দেবতাকে ডাকতেন। দেবতার ডাকে সাড়া দিত যারা, তারা সব বহুযুগের ওপার থেকে আসা তিন-চারটে সাহেবি, আধাসাহেবি ছোটো ছেলেমেয়ে, সঙ্গে আবার কয়েকটা কুকুর বেড়াল। ঝপাঝপ ছাদে এসে তারা কোলে-পিঠে চাপত, হুল্লোড় লাগাত, 'আন্টি'-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলতো— 'ছিঃ। আর কেঁদো না, ডিয়ারি!' আদর-দেওয়া, আদর-কাড়া এইসব ছেলেমেয়েরা 'ভূত' গল্পনাম সত্ত্বেও ভূত ও ভগবানের মধ্যেকার বিভাজন-রেখাটিকে আবছা করে দেয়। 'মাতৃত্ব' নামক অভিজ্ঞানটি যে প্রথাবদ্ধভাবে কেবল স্নেহ-দাত্রীই নয়, স্নেহ-বুভুক্ষু এবং গ্রহীত্রী-ও বটে, সেই সমীকরণটিকে স্পষ্ট করে দেয় এমন গল্প।

।।৫।।

সন্দেশের স্বাদুতা আর পুষ্টিগুণের অনুসরণে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর *সন্দেশ* পত্রিকাকে জন্মলগ্ন থেকেই দু'টি উদ্দেশ্যে চালিত করতে চেয়েছিলেন। প্রথম, সুখপাঠ্যতা আর দ্বিতীয়, সুশিক্ষা। এই সুশিক্ষা অবশ্য নয় নীতিকথার বোঝা। রায়চৌধুরী পরিবারের মৌল সাদৃশ্যের কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেন তাঁদের লেখায় কোথাও ছোটোদের পিঠ-চাপড়ানি নেই, ওপর-পড়া ইস্কুল-মাস্টারি নেই, নেই ছোটোদের নিতান্ত 'ছোটো' ভাবার মতো অসম্মান ও ভুল। ফলে তাঁদের গল্পের ভিতর সুনীতির যে পাঠটুকু থাকে তা গল্পের মধ্য থেকে আপনিই জেগে ওঠে। তাঁদের গল্পের উপদেশ হল সেই জাতের "যা বালকেরা নিজেরাই মাঝে-মাঝে কৃতজ্ঞ চিত্তে নিয়ে থাকে জীবন থেকে।"[১২]

১৯০৮ থেকে ২০০৭ - প্রায় শতবর্ষব্যাপী জীবৎকাল লীলার। আর সেইসঙ্গে প্রায় অশীতি বৎসরব্যাপী সাহিত্যসাধনা। ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে শিলংয়ের বাস তুলে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসেন তাঁরা।[১৩] তার আগে মহাযুদ্ধ, দারিদ্র্য, স্বাধীনতা-যুদ্ধের উত্তাপ সেভাবে গায়ে লাগেনি বালিকা লীলার। যদিও অপরীকরণের দুঃখ আর অপমানকে চিনে ফেলতে হয়েছিল ছেলেবেলাতেই। মেম-ইস্কুলের অভিজ্ঞতায় জেনেছিলেন কিছু ফিরিঙ্গি শিক্ষিকা আর সহপাঠীদের নেটিভ-বিদ্বেষ। গড যদি এতই দয়ালু তবে তাঁকে শিলাকের মতো ফর্সা করলেন না কেন; মাকে এমন প্রশ্ন করেছিল অবুঝ বালিকা।[১৪] সেই সঙ্গে আশৈশব ছিল দুঃখে, দারিদ্র্যে আর অনাদরে বড়ো হওয়া শিশুদের জন্য, মাতৃহীন শিশুদের জন্য সুগভীর সহমর্মিতা।[১৫] লীলা মজুমদারের গল্পে-উপন্যাসিকায় ফিরে-ফিরে আসে এইসব হতদরিদ্র, হতকুচ্ছিৎ, লক্ষ্মীছাড়া, অনাদৃত কৈশোর। বলাবাহুল্য আরোপিত কোনো উপদেশ বা কারুণ্যের ব্যাখ্যান সেখানে শোনান না লেখিকা; গল্পের অন্তঃশীল স্রোতে শুধু বইতে থাকে শুশ্রূষার শীতল জল।

> "নিম গাছতলায় ভূত আছে।
> একদিন ভোর বেলায়, মই বগলে ছাগলদাড়ি লোকটা রাস্তার আলো নিবিয়ে নিবিয়ে চলে গেলে পর, নেড়ু দেখেছিল কোমরে রুপোর ঘুনসিওয়ালা, মাথায় গুটিকতক কোঁকড়া চুল, ভূতদের ছোটো কালো ছেলে নিম গাছতলায় কাঁসার বাটিতে নিম ফুল কুড়চ্ছে। নেড়ুকে দেখেই ছেলেটা এক চোখ বুজে বগ দেখাল। নেড়ু ভাবল, ভূত কিনা, তাই ভদ্রলোক নয়।"[১৬]

আলোয়, ভালোয় বড়ো হয়ে ওঠা শৈশবের উল্টোদিকে, সুখী আর সম্পন্ন শৈশবের বিপরীতে আছে আরেকটা অন্ধকার শৈশব। আছে ক্ষুধার্ত, ক্ষমাহীন অন্য পৃথিবীর জাতকরা, যারা কালো-কুলো, নোংরা-ন্যাংটো, হ্যাংলা-প্যাংলা আর সেই সঙ্গে কখনো বা চোর আর অতি-বজ্জাত। পরিবারের স্নেহচ্ছায়ায় বড়ো হওয়া শিশুরা এই শ্রীহীন নির্মম দুনিয়াটিকে চিনতে শেখে ভয়ে ও ঘৃণায়। গ্রামের উপান্তবাসী নিঃসহায় নিঃসম্বল আতুরী বুড়িকে যেমন ডাইনি বলেই চিনতো অপু, নীলুরা। এমনই দুই পৃথিবীর দুই বিপ্রতীপ শৈশব নিয়ে ছোট্ট একটি গল্প লিখেছিলেন লীলা। গল্পের নাম 'ভূতের ছেলে'।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 291
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শহরের আলোর নীচে জমে থাকা আবছায়া আর আঁধারে ঘোরাফেরা করা ছোটো ছানাটিকে নেডু চিনতো ভূতেদের খোকা বলে। ফটফটে সকালে বাড়ির দারোয়ানদের হাতে তাকে মার খেতে দেখে নেডু অবশ্য বোঝে ভূতের ছানার চেয়েও হিংস্রতর সাহসের অধিকারী আসলে পাড়াসুদ্ধ বড়োরা!

এমনি সব 'ভূতের ছেলে'-রা ছড়িয়ে আছে লীলার বিভিন্ন ভূতের গল্পে। 'তেপান্তরের পারের বাড়ি' গল্পে যেমন একজোড়া দুষ্টু ছেলে নটে আর গুরুর ওপর দায়িত্ব পড়ে তেপান্তরের মাঠের পারের হানাবাড়ি থেকে ভূত তাড়ানোর। পনেরোটি টাকা আর কচুরি, আলুর চাট, মিঠে গজা, লেমোনেডের মতো লোভনীয় টিফিনের বিনিময়ে বাড়ির মালিক তাদের সে বাড়িতে রাত কাটাতে আর দেওয়ালে-দেওয়ালে হরিনাম লিখে আসতে পাঠান। তাঁর গিন্নি আপত্তি করলে মালিক বলেন,-

> "কাকে দুধের বাছা বলছ? ওদের দেখলে দুধ কেটে ছানা বেরোয়। ওরা হল গিয়ে কালীঘাটের মার্কামারা ছোঁড়া!"[১৭]

'মার্কামারা ছোঁড়া' শব্দবন্ধ বুঝিয়ে দেয় নটে ও গুরু ঠিক সেই জাতের ভালো ছেলে নয়, যারা পড়াশুনো খেলাধুলোময় শৈশবের আশীর্বাদ-ধন্য। যা হোক, নটে-গুরু বাড়িতে পৌঁছে দেখল কোথায় বা শুনশান ভূতের বাড়ি! কুচকুচে কালো রঙ, উসকো-খুসকো চুল, বদমাইশের ধাড়ি একগাদা ছেলেপিলে বাড়ি, বাগান, পাঁচিল জুড়ে গমগম করছে। তাদের হইচই, হ্যা-হ্যা, চ্যাঁ-ভ্যাঁ-য় কান পাতা দায়। নিশ্চয়ই উদ্বাস্তুদের ছেলেপিলে এরা। প্রথমেই আম গাছের মগডাল থেকে একটা বিশ-হাতি 'দুষ্টু ছেলের মালা' করে ঝুলে এসে তারা নটে-গুরুর টিফিনের চুপড়িটা বাজেয়াপ্ত করে ফেলল। টিফিন শেষ করে তারা ভারি খুশি। নটে-গুরুর সঙ্গে বন্ধুতা পাতিয়ে নিজেরাই খুলে দিল বাড়ির ফটক। নটে-গুরু এ-বাড়ির সব দেওয়ালে হরিনাম লিখে দিতে পারলে এখানে অনাথ-আশ্রম হবে; যাদের বাড়িঘর নেই, বাপ-মা নেই, তারা দু'বেলা গরম ভাত, খিচুড়ি আর রুটি পাবে শুনে দুষ্টু ছেলেরা আরও খুশি। পাঁচ মিনিটে তারা নিজেরাই লাফালাফি করে দেওয়ালে-দেওয়ালে হরিনাম লিখে ফেলল। পরদিন ভোর থেকে আর তাদের দেখা মিলল না কোথাও। 'ভূতের ছেলে'দের মানুষ-জীবন উপহার দিতে বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গেল সত্যিকার ভূতুড়ে ছেলেপিলেরা। বাসনা পূর্ণ হলে নাকি জীবের বন্ধনমুক্তি ঘটে। কে জানে ভবিষ্যতের ক্ষুধার্ত শিশুদের মধ্য দিয়ে 'একমুঠো গরম ভাত'-এর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে মুক্তিলাভ করেছিল কিনা তেপান্তরের পারের ছেলেমেয়েদের দল!

গল্পের নাম 'লক্ষ্মী'। লক্ষ্মী নামের দুষ্টু মেয়েটিকে তালা-বন্ধ রেখে বাকিদের নিয়ে পিকনিকে চলে গেছিলেন তার বোর্ডিংয়ের দিদিমণি। কিন্তু লক্ষ্মীকে বেশিক্ষণ বন্দী থাকতে হয়নি। অচিরেই তার চেয়েও কয়েক কাঠি বাড়া দুষ্টু একদঙ্গল মেয়ে এসে তাকে ঘর খুলে দেয়। লক্ষ্মীকে নিয়ে তারা পাহাড় বেয়ে নিষিদ্ধ পথে বেড়ায়, রডোডেনড্রনের ডালে দোলে, মিঠে মিঠে লাল-কালো থোপা বেরি আর আঁজলা আঁজলা মণিঝোরার জল খায়। এই মহা-দুষ্টু মেয়েরা সব নাকি মণি-ঝোরার ওপারের বোর্ডিং ইস্কুলের ছাত্রী। লক্ষ্মী অবশ্য শুনেছিল ওখানে 'দুষ্টু' মেয়েদের 'ভালো' বানানোর ইস্কুলটা ধ্বসে পড়ে মুছে গেছে অনেককাল। তবে জেঠি লক্ষ্মীর চিবুক ধরে বলেন, মণি-ঝোরার জল খেলে মানুষ যা নেই তাই দেখে! আর না খেলে? এসব স্নেহবঞ্চিত, ঘর-হারা, দুষ্টু ছেলেমেয়েদের দেখতে পাওয়ার আর ভালোবাসতে পারার মন বোধহয় তৈরি হয় না!

## ।। ৬।।

জেঠুর লেখা গল্পগুলোয় ভূতেরা মানুষের বন্ধু আর বাঘেরা এতো বোকা হয় কেন? ভ্রাতুষ্পুত্র হিতেন্দ্রকিশোরের এই প্রশ্নের উত্তরে উপেন্দ্রকিশোর বুঝিয়ে বলেছিলেন কেমন করে লোকগল্প জনমনের প্রতিবাদ আর আকাঙ্ক্ষা বহন করে দুর্বলের কাছে সবলকে হারিয়ে দেয় কিংবা শক্তিমানকে করে তোলে দুর্বলের সহায়।[১৮]

'ফ্যান্টাস্টিক', 'তোজো'-র মতো গল্পগুলোয় দুর্বলের সহায়-স্বজন লাভের বার্তাই দিয়েছিলেন লীলা। বিশেষত্ব এই যে দু'ক্ষেত্রেই শক্তি আর সাহসের বার্তাবহ হয়েছিল দু'টি অবলা প্রাণী— দু'টি পাহাড়ী কুকুর।

স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে-বৌমা সকলের পাশ-ঠেলা অতিনিরীহ মানুষ ছোটমামা। পাড়ার সব লোকের, এমনকি পাড়ার নেড়ি কুকুরগুলোরও তিনি আত্মজন; সদাহাস্য, সদানন্দ। বিধি আর গিন্নির বিরোধিতায় যদিও নাতি, নাতনি, কি একটা পোষ্য কুকুর কাউকেই কাছে রাখতে পান না। পাকেচক্রে দার্জিলিংয়ে হাওয়া বদলাতে গিয়ে ছোটমামা উঠলেন ডাক্তার ভাগতের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 291
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাংলোয়। বহুদিনের ইচ্ছা পূরণ করে ডা. ভাগতের রেড নামের ঝাঁকড়া-চুলো কুকুরটি হয়ে উঠল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। ফেরার দিনে অবশ্য বোঝা গেল যে এই বাংলো, বেয়ারা, রাঁধুনি বামুন, কুকুর সবই কবেকার ধ্বসে হারিয়ে যাওয়া প্রকাণ্ড এক শূন্যতা। সেই শূন্যতার সামনে কুয়াশার ভিতরে ঝাপসা চোখে চেয়ে থাকা মামা তখনই হাতের নীচে টের পেলেন রেশমের মতো নরম একটা মাথা। আর—

> "মনটা অমনি শান্ত হয়ে গেল। জীবনের ব্যর্থতাগুলোকে মনে হল কিছু না। সল্ট হিল রোডের নিচে পৌঁছে, রেড ওর হাত চেটে দিয়ে চলে গেল।"[১৯]

এমন মন-খারাপ উধাও করা ম্যাজিক-ভালোবাসার গল্পটির নাম 'ফ্যান্টাস্টিক' হবে; সন্দেহ কী!

শিলংয়ের বাড়িতে ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল, হাঁস থেকে জঙ্গলের হাতি, সাপ, মাকড়শা সবের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল ছোটো লীলাদের। *বাঘের বই, হাতি হাতি, জানোয়ার, কাগ-নয়, বেড়ালের বই, কুকুর এবং অন্যরা, ময়না শালিখ*-এর মতো বইগুলোতে, আর তাছাড়াও 'টাইগার', 'বনবাসী', 'বনের ধারে', 'ভালোবাসা'-র মতো অন্যান্য সংকলনভুক্ত গল্পে পাঠকদের তিনি শুনিয়েছেন ছোটো থেকে বড়ো, পোষ্য থেকে পোষ-না-মানা পশুপাখিদের গল্প। কিশোরীবেলায় শিলং ছেড়ে কলকাতা আসার সময়ে পোষা ঘোড়া কালোমানিককে বেচে দেওয়া হল। কালোমানিকের অতল কালো দুই দীঘি চোখের দিকে চেয়ে-চেয়ে গলার ভিতর সেদিন কেমন কষ্ট দলা পাকিয়ে ওঠেছিল, তা স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন লীলা।[২০]

এই স্মৃতিতেই সিঞ্চিত হয়েছে তাঁর 'তোজো' নামের গল্পটি। ছোট্ট পাহাড়ি গাঁয়ের সব ছেলেমেয়েরাই ভালোবাসত 'তোজো'কে। তোজো একটা বাছুরের মতো বড়ো আর রাগী কুকুর। কিন্তু ছোটোদের সে কিচ্ছু বলে না। বরং বিপদে পড়ে কোনো ছোটো ছেলে ডাক দিলেই কোথা থেকে এসে আগলে দাঁড়ায় তোজো। নবুকে সেকথা বলেছিল শম্ভু। নবু অবশ্য ভীতু ছেলে, পাতার খড়াখড়ানিতেও সে ভয়ে অস্থির হয়। তবে সত্যিকারের বিপদে তাকে বাঁচাতে ঠিকই ছুটে আসে তোজো। নবু দেখে তোজোকে ঠিক তার জেঠুর কুকুর টাইগারের মতোই দেখতে। যে টাইগারকে বিক্রি করে তাদের এবার চলে যেতে হচ্ছে কলকাতা। গল্পশেষে অবশ্য মধুর সমাপন। জেঠু টাইগারকে বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর ঠাকুরদাদার মৃত কুকুর তোজো-য় আর জেঠুর টাইগারে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া বিশালদেহী প্রাণীটিকে জাপ্টে ধরে ভালোবাসা আর ভরসার উত্তাপটুকু নিঃশেষে শুষে নিতে থাকল নবু।

।। ৭।।

অলৌকিক গল্পের মধ্যে 'সোনালি রূপালি' আর 'আলোছায়া' লেখা হয়েছিল তথাকথিত বয়স্ক পাঠকের কথা ভেবেই। বুদ্ধদেব বসুর আমন্ত্রণে ১৯৩৯ সালের *বৈশাখী* বার্ষিকীর জন্য 'সোনালি রূপালি' গল্পটি লেখেন লীলা। 'আলোছায়া' গল্পে হৃদয়হীন রূপসীর অপঘাত মৃত্যু হয় প্রথম হৃদয়-বেদনার অভিঘাতে। আর অনেককালের পুরোনো বাসায় ঘর করতে এসে স্বপ্নদর্শী রোম্যান্স-সন্ধিৎসু তরুণী অসম্পূর্ণ তৈলচিত্রের ভিতরের এক অপরূপাকে নিয়ে মোহিত হয়ে পড়ে 'সোনালি রূপালি' গল্পে। তার বেশ কয়েক মাসের দিনরাত্রি এরপর অদৃশ্য রঙে রাঙিয়ে ওঠে, ফেনিয়ে ওঠে। এ গল্পদু'টি ঠিক ভূতের গল্প নয়, তবে অতিলৌকিক গল্প বটে। অংশত এরা মনে করিয়ে দেয় 'কঙ্কাল'-'মণিহারা' আর 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর অনুষঙ্গ। মনোদেশের সমজাতীয় জটিলতা থেকে উদ্ভূত এদের অতিলৌকিকতা। 'সোহম' নামক গল্পটিতেও আছে সত্তার জটিল আঁধারের বুনন। দাপুটে রাজনীতিবিদ্ কিশোরীবাবু একদিন নিজেরই পূর্বজীবনকে দেখতে পান নিজের টেবিলের উল্টো পারে। কিশোরীবাবুর কাছে চূড়ান্ত অপমানিত হয়ে যুবক 'কিশোরীলাল' যখন চলে গেল, তখন কিশোরীবাবুর হঠাৎ মনে পড়ল এতক্ষণের চেনা-চেনা যুবকটির মুখ তিনি আসলে রোজ দেখতেন আয়নায়, আজ থেকে বহু বছর আগে। বিত্তবান ও ক্ষমতাবান; স্পষ্টতই বহু অন্যায়ের সিঁড়ি বেয়ে এই ক্ষমতা আর বিত্তের চড়াইয়ে ওঠা আজকের কিশোরীবাবুর হঠাৎ মনে পড়ে যায় ময়লা শাড়ি পরা তাঁর মায়ের নখ-ভাঙা, শিল-ছ্যাঁচা, পোড়-খাওয়া হাতে কিশোরীলালের মাথায় হাত বুলানোর কথা। কোন্ কিশোরী সত্যি? কালের আর অস্তিত্বের অজানা বাঁকে জমাট হয়ে ওঠে বিস্ময়, অস্বস্তি ও ভয়। কিশোরীবাবুর পথ আটকে দাঁড়ায় কিশোরীলালের ভূত— তাঁর অতীত।[২১]

অতীত বহুমাত্রিক। ব্যক্তিমানুষের অতীত, স্থানবিশেষের অতীত, কালগত অতীত। একটা জীবন, একটা ঘর, কয়েকটা ঘড়ির আবর্তন। এসবের সমস্ত ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, ব্যর্থতা আর অপ্রাপ্তি পেরিয়ে আছে মহাসময়ের মানুষের কথা। সেই ছমছমে বিশালতার কাছে শুধু তুলে দিতে যেতে হবে আজীবনের সোনার শস্যটুকু। এক জীবনের সেটুকুই সানন্দ সামর্থ্য। উত্তরসূরি লীলাকে এমন কথাই তো শিখিয়েছিলেন বড়দা সুকুমার। 'সে আনন্দ আলোর মতো/ থাকুক তব জীবন ভরি।'[২২] সেই আনন্দেরই অভিমুখে লীলার কলমের অভিযাত্রা। চিরকালের সবুজ মনেরা সেই পথে তাঁর সহযাত্রী।

## Reference:

১. "ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর-কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা-অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ছেলেভুলানো ছড়া", 'লোকসাহিত্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ : কলিকাতা, সংস্করণ : পৌষ ১৩৪৫, পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৯৯, পৃষ্ঠা : ৭

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ঘরের পড়া", 'জীবনস্মৃতি', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ : কলিকাতা, বিদ্যালয়-পাঠ্য সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৮০, পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৩৮২, পৃষ্ঠা : ৭১

৩. 'লোক'-সাহিত্য আর প্রমিত-সাহিত্যের ভেদাভেদ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও আপাতত আমরা রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত 'লোকসাহিত্য' (প্রথম প্রকাশ : ১৩১৪ ব.) অভিধাটিকে গোষ্ঠীগত সাহিত্য বোঝাতে ব্যবহার করছি। নতুন সময়ের সাহিত্যিকরা একদিকে যেমন দেশ-বিদেশের লোকসাহিত্যকে অনুবাদ ও সংকলনের মাধ্যমে বাঙালি পাঠকের কাছে সহজলভ্য করে দিচ্ছিলেন (লালবিহারী দে, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী থেকে সুখলতা রাও, পুণ্যলতা রায়, দেবজ্যোতি মজুমদার, শৈলেন ঘোষ প্রমুখ) অন্যদিকে তেমনই লোকগল্পের আদলে নতুন গল্পও তৈরি হচ্ছিল ত্রৈলোক্যনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ হয়ে বুদ্ধদেব বসু, সত্যজিৎ রায়দের কলমে।

৪. কিশোর সাহিত্যে উদ্ধৃত তৃতীয় বিশ্বের নায়কদের যাবতীয় সাহস, উদ্যম আর বীরত্ব যে প্রথম বিশ্বের ব্যর্থ অনুকরণমাত্রেই পর্যবসিত হয়, সেবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা পাই শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য', কারিগর : কলকাতা ৪, কারিগর দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা : ২৮৭ - ২৯০

৫. এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়তো বাহুল্য নয় যে মন ও মনসমীক্ষণের নতুন দুনিয়ার আবিষ্কার অলৌকিক গল্পের পুষ্টির অন্যতম বড়ো কারণ। কেবল কিশোর গল্পে নয়, আধুনিক সমস্ত সাহিত্যেই আছে যুক্তির এই পরাজয়, উত্তরহীন অসহায়তা, যা তৈরি করে ভয় আর বীভৎসার সূক্ষ্ম, আবেগী টানাপোড়েন। যে-কারণে এডগার এলান পো বোদলেয়র থেকে মালার্মে প্রমুখ আধুনিক কবিদের অনুপ্রাণনা যোগান, যে পো-এর সর্বাধিক জনপ্রিয়তা সম্ভবত অলৌকিক এবং ভয়ের গল্পের রচয়িতা হিসেবেই।

৬. লীলা মজুমদার, "পিলখানা", 'সব ভুতুড়ে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা ৯, প্রথম সংস্করণ : জুন ১৯৮৩, চতুর্দশ মুদ্রণ : মার্চ ২০১২, পৃষ্ঠা : ৭৪

৭. "...গোয়েন্দা ও তাঁর সহকারীর আত্মীয় পরিজনদের দেখিনা কেন ?...ফেলুদা না হয় ছোটবেলায় বাপ্-মা হারিয়েছে, কিন্তু তোপসের মা-বাবারা গেল কোথায়? দু'জনেরই ঠামু-দিদু, মামা-কাকা মাসি-পিসি কেউ নেই?" লীলা মজুমদার, ভূমিকা : 'ফেলুচাঁদ', 'ফেলুদা সমগ্র ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা ৯, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৫, অষ্টম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১১, কলকাতা, পৃষ্ঠা : গ

৮. প্রসঙ্গত, লীলা মজুমদারের কিশোর গল্পের এই গুণদু'টি; অর্থাৎ একটি বেশ বড়োসড়ো খামখেয়ালি পরিবারের ছত্রছায়া আর চোর-ডাকাত-ভূতের মতো সচরাচর ভয়ের উপাদানগুলোকে ভিন্নার্থে দেখিয়ে একটি সহমর্মী

মানবতার বোধি জাগিয়ে তোলা— অনেকখানি অনুসৃত হয়েছে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অদ্ভুতুড়ে কিশোর-গল্প সিরিজগুলোতে।

৯. লীলা মজুমদার, মুখবন্ধ, 'সব ভুতুড়ে', প্রাগুক্ত

১০. লীলা মজুমদার, "অহিদিদির বন্ধুরা", 'সব ভুতুড়ে', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৮-৯

১১. ঐ, পৃষ্ঠা : ১১

১২. বুদ্ধদেব বসু, "বাংলা শিশুসাহিত্য", 'প্রবন্ধ সংকলন', দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা ৭৩, প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৬, পৃষ্ঠা : ১৬১

১৩. লীলা মজুমদার, 'আর কোনোখানে', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৭৪, ঊনবিংশ মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৯, পৃষ্ঠা : ৭০

১৪. লীলা মজুমদার, 'পাকদণ্ডী', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা ৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ : মার্চ ২০০৭, পৃষ্ঠা : ৩১

১৫. "মার মুখে এইরকম সাংঘাতিক কথা (শৈশবে মাতৃহীনতার কথা) শুনে আমাদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেছিল। মা না থাকলেও মানুষ বাঁচে, তা জানতাম না।"

ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৯

১৬. লীলা মজুমদার, "ভূতের ছেলে", 'ছোটদের অমনিবাস', এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি : কলকাতা ৭, প্রথম প্রকাশ : ২৭ জানুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ২৬ জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা : ১১

১৭. লীলা মজুমদার, "তেপান্তরের পারের বাড়ি", 'সব ভুতুড়ে', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৮৯-৯০

১৮. হিতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, 'উপেন্দ্রকিশোর ও মসুয়া রায় পরিবারের গল্পসল্প', ফার্মা কে এল এম প্রা. লি. : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯ ফাল্গুন ১৩৯০, পৃষ্ঠা : ৭৭

১৯. লীলা মজুমদার, "ফ্যান্টাস্টিক", 'সব ভুতুড়ে', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৪

২০. লীলা মজুমদার, 'পাকদণ্ডী', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৭৬-৭৭

২১. অস্তিবাদী দর্শনের নিরিখে ভূতের গল্পের এইসব কুটিল অস্তি ও নাস্তির দ্বৈততাগুলোকে আলোচনায় এনেছেন অধ্যাপক আব্দুল কাফি।

আব্দুল কাফি, "ছায়াশরীরের গল্প", 'ছায়াশরীর : সেকাল একালের ভূতের গল্প', সম্পা. আব্দুল কাফি, ঋকসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় পরিসর : কলকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা : ৭-১০

২২. শৈলশেখর মিত্র : ভূমিকা, 'ছোটদের অমনিবাস', প্রাগুক্ত